বিজ্ঞান ও ধর্ম

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

বিগত শতকে (লেখক এখানে উনিশ শতক বুঝিয়েছেন) এবং তার আগের শতকেরও একটা অংশে, এ-ধারণাটাই ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল যে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে একটা দুরপনেয় সংঘাত রয়েছে। উন্নতমনা মানুষদের মধ্যে এ-মতটার চলন ছিল যে বিশ্বাসের জায়গাটা আরও বেশি করে জ্ঞান দিয়ে পূরণ করার সময় এসেছে, যে-বিশ্বাস জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয় তা হল কুসংস্কার এবং সে-কারণে তার বিরোধিতা প্রয়োজন। এ-ধারণা অনুসারে, শিক্ষার একমাত্র কাজ হল মনন ও জ্ঞানার্জনের পথটা খুলে দেওয়া, এবং জনগণের শিক্ষার প্রধান উপায় হিসাবে স্কুল সম্পূর্ণত এ-উদ্দেশ্য পালন করবে।

যুক্তিবাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে এতটা স্থূলভাবে কদাচিৎই হয়তো ব্যাক্ত হতে দেখা যাবে, কারণ, বিচক্ষণ মানুষমাত্রই বুঝতে পারবেন অবস্থানের এমন বর্ণনা কতটা একতরফা হয়ে পড়ে। কিন্তু কোনো মত সম্পর্কে ধারণা পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে তা খোলাখুলি ও নগ্নভাবে প্রকাশ করাই সমীচীন।

এটা সত্যি কথা যে আমাদের প্রত্যয়ের সমর্থন পেতে হলে অভিজ্ঞতা ও পরিচ্ছন্ন মননের উপর নির্ভর করাই সর্বোত্তম পন্থা। এ-বিষয়টি নিয়ে চরম যুক্তিবাদীর সঙ্গে নির্দ্বিধায় একমত হতেই হবে। তবে এ-ধারণার দুর্বল অংশ হল এই যে আমাদের আচরণ ও বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় ও নিয়ামক প্রত্যয়গুলি শুধুমাত্র এই নির্ভেজাল বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় লাভ করা সম্ভব নয়।

কারণ, তথ্যসমূহ পরস্পর কীভাবে সম্পৃক্ত এবং পরস্পর কিভাবে নির্ভরশীল এর অধিক কিছু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে শেখা সম্ভব নয়। এমন বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের আকাঙ্খা মানবিক সামর্থ্যের উচচতম পর্যায়ে অবস্থিত, এবং আপনারা নিশ্চয় এমন সন্দেহ করবেন না যে এই ক্ষেত্রে মানুষের অবদান ও সাহসী প্রয়াসকে ছোট করে দেখাতে চাই। তথাপি এটাও সমান পরিষ্কার যে যা বিদ্যমান তার সম্বন্ধে জ্ঞান কী হওয়া সমীচীন তার দুয়ার প্রত্যক্ষভাবে খুলে দেয় না। কী বিদ্যমান সে-সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত পরিষ্কার ও সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের মানবিক আকাঙ্খার লক্ষ্য কী হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব হতে পারে। বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান কিছু লক্ষ্যে এবং তাতে পৌঁছবার জন্য বলিষ্ঠ হাতিয়ার দিতে পারে, কিন্তু চরম লক্ষ্য এবং তাতে পৌঁছাবার স্পৃহা আসবে অন্যতর উৎস থেকে। এ-মত নিয়ে তর্ককরার বিশেষ প্রয়োজন দেখি না যে আমাদের অস্তিত্ব এবং আমাদের কাজকর্ম তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন এমন লক্ষ্য এবং তদনুযায়ী মূল্যবোধ স্থাপন করা যায়। সত্য সম্পর্কে জ্ঞান এমনিতে চমৎকার, কিন্তু পথপ্রদর্শক হিসাবে এর কার্যকরতা এতটাই কম যে সে -সত্যের প্রতি আকাঙ্খার সমর্থন জ্ঞান এবং তার মূল্য প্রমাণ করাও এর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং আমরা এখানে অস্তিত্বের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ধারণার সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হই।

কিন্তু লক্ষ্য স্থির করা এবং নীতি সম্মত বিচারের মধ্যে বুদ্ধিনির্ভর মননের কোনো ভূমিকা নেই এমন মনে করা সঙ্গত নয়।

কোনো মানুষের যখন হৃদয়ঙ্গম হয় যে একটি লক্ষ্যে পোঁছতে হলে বিশেষ কোনো উপায় সহায়ক হবে, তখন সে-উপায়টিই এভাবে একটি লক্ষ্যে পরিণত হয়। উদ্দেশ্য ও উপায়ের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি আমাদের বুদ্ধির দৌলতে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু শুধু মনন আমাদের পরম ও মৌল উদ্দেশ্যের ধারণা দিতে সক্ষম নয়। এই মৌল উদ্দেশ্য ও মূল্যায়নকে স্পষ্ট করা এবং ব্যক্তির আবেগগত জীবনে তাদের দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা- আমার কাছে মনে হয় এ-ই হল প্রকৃত অর্থেমানুষের সামাাজিক জীবনে ধর্মের সর্বাপেক্ষা গুত্বপূর্ণ কাজ। এবং কেউ যদি প্রা করেন এমন মৌল লক্ষ্যের অধিকার কোথা থেকে উদ্ভুত , কারণ শুধু যুক্তি দিয়ে তাদের প্রকাশ করা এবং সমর্থন দান সম্ভব নয়, তা হলে একটাই উত্তর হতে পারে, একটা সুস্থ সমাজে এগুলি বলিষ্ঠ ঐতিহ্য হিসাবে থাকে এবং ব্যক্তির আচরণ, আকাঙ্খা ও বিচারের উপর এগুলি ক্রিয়াশীল হয়, অর্থাৎ এগুলি সজীবরূপে বর্তমান, এজন্য তাদের অস্তিত্বের পেছনে কোনো ন্যায়-সঙ্গততা খোঁজার চেষ্টা করা অর্থহীন, বরং সহজভাবে এবং স্পষ্ট করে এদের প্রকৃতি অনুভব করতে হবে।

আমাদের আকাঙ্খা ও বিচারের উচচতম নীতিগুলি আমরা পেয়েছি ইহুদী-খৃষ্টীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে। ঐটি অত্যুচচ এক লক্ষ্য এবং আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে আমরা খুবই অপর্যাপ্তভাবে এ-লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি, কিন্তু আমাদের আকাঙ্খা ও মূল্যায়নকে এ-ই শক্তি ভিত্তির উপর স্থাপন করবে। যদি তার ধর্মীয় রূপ থেকে লক্ষ্যটিকে বের করে নেওয়া হয় এবং শুধু তার মানবিক দিকটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, তবে হয়তো এটিকে নিজের মতো করে ব্যক্ত করা যায় ব্যক্তির এরূপ স্বাধীন ও দায়িত্বসম্পন্ন বিকাশ যার ফলে সে মানবসমাজের সেবায় স্বাধীনভাবে এবং সানন্দে স্বীয় ক্ষমতাকে নিয়োজিত করতে পারে।

এজন্য কোনো জাতি বা কোনো শ্রেণীর- ব্যক্তির কথা ছেড়ে দিলাম- দৈব রূপ দানের অবহকাশ নেই। ধর্মীয় ভাষায় বলা যায় আমরা সবাই কি এক পিতার সন্তান নই ? বস্তুত, একটি বিমূর্ত সমষ্টি হিসাবে মানবতার দৈবরূপ দানও এই আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না। আত্মা রয়েছে শুধু ব্যষ্টির মধ্যেই। এবং ব্যষ্টির মহতী নিয়তি হল সেবা করা, প্রভুত্ব করা বা অন্য কোনো ভাবে নিজেকে জাহির করা নয়।

যদি বহিরঙ্গের দিকে না তাকিয়ে সারবস্তুর দিকে তাকানো যায়, তা হলে এই কথাগুলিতে মৌল গণতান্ত্রিক অবস্থান ব্যক্ত হয়েছে এমন মনে করা যেতে পারে। একজন প্রকৃত গণতন্ত্রী মানুষ তার জাতিকে মাত্র ততটাই পূজ্যজ্ঞান করতে পারেন যতটা পারেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ।

এসবের মধ্যে শিক্ষার এবং স্কুলের ভূমিকা তা হলে কী দাঁড়ায় ? তারা ছেলে মেয়েদের এমন প্রাণময়তায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করবে যেন এই মৌলনীতিগুলি তার কাছেশ্বাসপ্রশ্বাসের বায়ুর মতোই সামান্য হয়ে ওঠে। শুধু শিক্ষণের মধ্য দিয়ে এক াজটি সম্পন্ন হওয়ার নয়।

যদি এই উচচনীতিগুলি স্পষ্টভাবে দৃষ্টির সামনে রাখা যায় এবং সমকালীন জীবন ও তার মর্মের সঙ্গে এদের তুলনা করা যায়, তা হলে এটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়ে যে সভ্য মানবজাতি আজকের দিনে গভীর বিপদের মধ্যে পড়েছে। সর্বকতৃত্বের রাষ্ট্রগুলিতে শাসকেরা নিজেরাই প্রকৃতপক্ষে মানবতার এই প্রাণসত্তাকে ধবংস করার উদ্যোগ নিয়েছেন। ন্যূনতর বিপন্ন অংশগুলিতে জাতীয়তাবাদ ও অসহিষ্ণুতা এবং অর্থনৈতিক পন্থায় ব্যক্তির নিপীড়ন এসব মূল্যবান ঐতিহ্যের শ্বাসরোধে প্রয়াসী।

তবে মননশীল মানুষের মধ্যে বিপদের বিরাটত্ব সম্পর্কে একটা সচেতনতা বিস্তৃতিলাভ করছে এবং এর মোকাবেলার জন্য পন্থা পদ্ধতির অন্বেষণও বেশ পরিমাণে চলছে-- জাতীয় ও আন্তজার্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং সাধারণভাবে সংগঠনের ক্ষেত্রে। নিঃসন্দেহে এমন প্রয়াসের খুব প্রয়োজন রয়েছে। তথাপি প্রাচীন কালের মানুষ এমন

কিছু জানতেন যা আমরা মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি। সকল পন্থাপদ্ধতিই কিন্তু একটা ধারহীন হাতিয়ারে পর্যবসিত হয় যদি না তাদের পশ্চাতে একটা সজীব প্রাণসত্তা থাকে। তবে আমাদের ভেতরে লক্ষ্যে পৌঁছবার বাসনা যদি প্রবলভাবে সজীব থ াকে, তা হলে লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় পাওয়ার এবং তাদের কার্যে রূপায়িত করার মতো শক্তির অভাব হবে না।

(২)

বিজ্ঞান বলতে আমরা কী বুঝি সে- সম্বন্ধে একটা সহমতে আসা খুব কঠিন হবে না। এজগতের উপলক্ষ্য পরিঘটনা সমূহ যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে সুশৃঙ্খল মননের মাধ্যমে একটি অনুষঙ্গে স্থাপন করার শতাব্দী-ব্যাপী প্রয়াসই হল বিজ্ঞান। সাহস করে বলা যায়, এ হল ধারণা-প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের উত্তর-পুনর্গঠন । যখন নিজেকে প্রশ্ন করি ধর্ম কী, তখন কিন্তু এত সহজে উত্তরটা মনে আসে না। এবং ঠিক এই মুহূর্তে সন্তুষ্ট হতে পারি এমন উত্তর পাওয়ার পরও আমি নিশ্চিত থাকি যে, যে সকল মানুষ এ-প্রশ্ন নিয়ে গভীর ভাবে বিবেচনা করেছেন তাদের সকলের ভাবনাকে এমনকী স্বল্প মাত্রায় গ্রথিত করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই প্রথমে ধর্ম কী এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে আমি বরং জানতে চাইব যে -মানুষ আমার কাছে ধার্মিকরূপে প্রতিভ াত তাঁর আকাঙ্খার বৈশিষ্ট্য কী ঃ - যে- মানুষ ধর্মীয় ভাবে উদ্বুদ্ধ তাঁকে দেখে মনে হবে যে তাঁর সামর্থ্যানুসারে তিনি স্ব ার্থভিত্তিক বাসনাসমূহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছেন এবং এমন চিন্তা, অনুভূতি ও আকাঙ্খা নিয়ে ব্যাপৃত রয়েছেন, যাতে তিনি লিপ্ত তাদের ব্যক্তি-অতীত বিষয়সার এবং তার প্রবল অর্থময়তা সম্পর্কিত প্রতীতির গভীরতা। কে ানো দৈবশক্তির সঙ্গে এই সারবস্তুর যোগ সাধনের প্রয়াস হয়েছে কিনা তা ধর্তব্য নয়, কারণ অন্যথা বুদ্ধ ও স্পিনোজাকে ধর্মীয় পুষ হিসাবে গণ্য কার সম্ভব নয়। তদনুসারে একজন ধর্মীয় পুষ এই অর্থে ধর্মপ্রাণ যে ঐ ব্যক্তি - অতীত বস্তু ও লক্ষ্যা দির তাৎপর্য ও মহত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সংশয় নেই সেসব বস্তু ও লক্ষ্যের যুক্তিবাদী ভিত্তি দেওয়ার প্রয়োজন নেই, দেওয়া সম্ভবও নয়। তাদের অস্তিত্বের পেছনে ততটাই প্রযোজন ও বাস্তবমুখিতা রয়েছে যতটা রয়েছে তাঁর নিজের অস্তিত্বের পেছনে। এ-অর্থে পূর্বোক্ত মূল্যবোধ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ও সম্পূর্ণভাবে সচেতন হওয়ার জন্য ও তাদের প্রভাবকে সবল ও প্রসারিত করার জন্য মানবজাতির যুগ-যুগব্যাপী প্রয়াসই হল ধর্ম। কেউ যদি ধর্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই সংজ্ঞানুস ারে ধারণা তৈরি করে, তা হলে দুয়ের মধ্যে সঙঘাত অসম্ভব মনে হবে। কারণ, বিজ্ঞান শুধু কী আছে তা-ই নিরূপণ করতে পারে, কী হওয়া উচিত তা নয়, এবং তার নিজ এলাকার বাইরে সকল প্রকার মূল্য বিচারের প্রয়োজন থেকে যায়। পক্ষ ান্তরে ধর্মেরবিষয়বস্তু শুধু মানবিক মনন ও কর্মের মূল্যায়ন ঃ তথ্য নিয়ে এবং বিভিন্ন তথ্যের সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলা সঙ্গ তভাবে তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এই ব্যাখ্যা অনুসরণ করলে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে অতীতের সুজ্ঞাত সংঘাতগুলির জন্য পূর্ববর্ণিত পরিস্থিতির অপ-উপলব্ধিকেই দায়ী করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ, বাইবেলে লিপিবদ্ধ সব উক্তির পরম সত্যতা যদি কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় দাবি করেন তবে সংঘাত দেখা দেয়। এর অর্থ ধর্মের দিক থেকে বিজ্ঞানের উপর হস্তক্ষেপ; গ্যালিলিও ও ডারউইনের তত্ত্বের বিদ্ধে চার্চের লড়াই এ- বর্গেই পড়বে। পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের প্রতিভূরা অনেক সময় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দিয়ে মূল্যবোধ ও লক্ষ্য সম্পর্কে মৌল বিচ ারে উপনীত হতে চেষ্টা করেছেন এবং এভাবে ধর্মের বিদ্ধতায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ-সংঘাতগুলি সবই মারাত্মক ভ্রান্তি থেকে উদ্ভুত।

এখন, যদিও ধর্ম ও বিজ্ঞানের জগৎ একে অন্য থেকে স্পষ্টভাবে বিভক্ত, তা সত্ত্বেও দুযের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও নির্ভরতা বিরাজমান। যদিও ধর্মের কাজ হল লক্ষ্য নিরূপণ করা, তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধতম অর্থে বিজ্ঞান থেকে ধর্ম শিখেছে তাঁর নিরূ

পিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে কোন্ উপায তার সহায়ক হবে। কিন্তু বিজ্ঞানের সৃষ্টির কাজটি শুধু তাঁরাই করতে পারেন যাঁর া নিজেরা সত্য ও উপলব্ধি প্রাপ্তির বাসনায় উদ্বুদ্ধ হযেছেন । আর এই বোধের উৎস ধর্ম সজ্ঞাত। ধর্মের জগতেই আবার রয়েছে এমন সম্ভাবনায় বিশ্বাস যে অস্তিত্বের জগতে প্রযোজ্য নিযমগুলি যুক্তিসম্মত অর্থাৎ যুক্তির কাছে অধিগম্য। এমন গভীর প্রতীতি না থাকলে কোনো প্রকৃত বিজ্ঞানীর কথা আমি ভাবতে পারি না। একটি রূপকল্প দিয়ে অবস্থাটা বোঝানো যেতে পারে; ধর্মের অভাবে বিজ্ঞান খঞ্জ হয়ে পড়বে, আর বিজ্ঞান না থাকলে ধর্ম অন্ধ হয়ে যাবে।

যদিও আমি উপরে জোরের সঙ্গে বলেছি যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে বস্তুত কোনো সংঘাত থাকতে পারে না, তবু এই উক্তিটিকে একটি মুখ্য দিক থেকে আবার বিশেষিত করতেই হবে- তা হল ঐতিহাসিক ধর্মগুলির বাস্তব বিষয়বস্তুর প্রসঙ্গে। এই বিশেষণ প্রয়োজন হয় যখন ঈশ্বরের ধারণার কথা ওঠে। মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিবর্তনের যৌবনকালে মানবিক কল্পন া মানুষের আদলেই দেবদেবীর সৃষ্টি করেছিল। ধরা হয়েছিল, তাঁদের ইচ্ছাশক্তির বলে দেবতারা ঘটনার জগৎকে নিরূ পিত করতে না পান, অন্ততঃপক্ষে প্রভাবিত করতে পারবেন। মানুষ যাদু ও প্রার্থনার বলে এই দেবদেবীর আচরণকে নিজের অনুকূলে পরিবর্তিত করতে চেয়েছে। বর্তমান কালের অধ্যাপিত ধর্মসমূহে যে ঈশ্বরের ধারণা রয়েছে তা পূর্বকালের দেবদেবীর ধারণারই পরিশীলিত রূপ। এর নবত্বারোপিত প্রকৃতিটি উদাহরণ হিসাবে দেখতে পাই যখন প্রার্থনার মধ্য দিযে দৈবশক্তির কাছে আবেদন জানায় এবং তার মনস্কামনা পূরণের জন্য ওকালতি করে।

কেউই নিশ্চয় অস্বীকার করবে না যে এক সর্বশক্তিমান্, ন্যায়পরায়ণ ও সর্বোপকারী ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্বের ধারণা ম ানুষকে সান্ত্বনা, সহায়তা ও পথনির্দেশ দিতে পারে; উপরন্তু এর সারল্যহেতু এ ধারণা নিতান্ত অপরিণত মনের কাছেও অধিগম্য। কিন্তু অপরদিকে এই ধারণার মধ্যে নিশ্চিতরূপে কিছু ত্রুটি বর্তমান যা ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে বেদনার সঙ্গে অনুভূত হয়েছে। অর্থাৎ যদি এই সত্তা সর্বশক্তিমান হন, প্রতি ঘটনা, মানুষের প্রতিটি কর্ম , প্রতিটি মানবিক ভাবনা এবং প্রতিটি মানবিক অনুভূতি ও আকাঙ্খা তাঁরই লীলা; এমন সর্বশক্তিমান সত্তার সামনে নরনারীকে তাদের কর্ম ও চিন্তার জন্য দায়ী করার কথা ভাবা কীভাবে সম্ভব মানুষকে দণ্ড ও পুরস্কার দিতে গিয়ে তিনি তো খানিক পরিমাণে নিজেরই বিচার করবেন। তাঁর উপর যে সত্য ও মহাবলের লক্ষণ আরোপিত হয় তার সঙ্গে এ-বিষয়টির কেমন করে সাযুজ্য পাওয়া য াবে?

ধর্মের জগৎ ও বিজ্ঞানের জগৎ এ-দুয়ের মধ্যে বর্তমান কালের সংঘাতের উৎস রয়েছে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণায়। দেশক ালে বিদ্যমান বস্তু ও ঘটনা সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণ করে এমন সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করাই বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এই নিয়মগুলির, বা প্রাকৃতিক নিয়মগুলির, পক্ষে নিতান্তই সাধারণভাবেই গ্রহণযোগ্যতার প্রয়োজন হয়-- প্রমাণের প্রয়ে াজন নেই। মুখ্যত এটি একটি কর্মসূচি এবং নীতিগতভাবে এর কার্যকরতার সম্ভাবনায় আস্থাসঞ্চারের জন্য আংশিক স াফল্যের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এমন মানুষ দুর্লভ যিনি এই আংশিক সাফল্যগুলিকে অস্বীকার করবেন এবং এদেরকে ম ানুষের আত্মপ্রবঞ্চনার ফল হিসাবে দেখবেন। এমন নিয়মের ভিত্তিতে যে কিছু এলাকার ঘটনার কালগত প্রকৃতি সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব অনেকটা সঠিকভাবে এবং নৈচিত্যের সঙ্গে তা আধুনিক মানুষের চেতনায় গভীরভাবে প্রোথিত, যদিও এসব নিয়মের বিষয়বস্তুর অল্পই হয়তো সে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। আর এটা মনে রাখলেই হবে যে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির সঞ্চারণ অত্যন্ত সঠিকভাবে আগে থেকেই গণনা করা যায় সীমিতসংখ্যক সরল নিয়মকে ভিত্তি করে। অনুরূপভাবে, এতটা সঠিকভাবে না হলেও একটি বৈদ্যুতিক মোটরের ক্রিয়া পদ্ধতি, একটি বিদ্যুৎ সঞ্চারণ ব্যবস্থার বা বেতারযন্ত্রের ক্রিয়া পদ্ধতি আগে থেকেই গণনা করা সম্ভব-- এমন কি যখন নতুন কিছু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করতে হয়।

ঠিক কথা, যখন জটিল কোনো পরিঘটনা-মণ্ডলে ক্রিয়াশীল কারণগুলির সংখ্যা অত্যধিক হযে পড়ে, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক্ষেত্রে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানেও পূর্বাভাসদান অসম্ভব হয়। তৎসত্ত্বেও এটা কেউ সন্দেহ করেনা যে আমাদের সামনে রযেছে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক, যার কারণ - উপাদানগুলি

মুখ্যত আমাদের জানা আছে। এক্ষেত্রে ঘটনাগুলি সঠিক পূর্বাভাস দানের অগম্য, বিচিত্র রকমের কারণ এখানে ক্রিয়াশীল বলে- প্রকৃতির মধ্যে শৃঙ্খলার অভাবের জন্য নয়।

সজীব বস্তুর জগতে যে নিয়মানুবর্তিতা কাজ করে তার মধ্যে আমরা অনেক কম গভীরভাবে প্রবেশ করেছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যতটা গভীরে যাওয়া সম্ভব হয়েছে তার ফলে স্থির আবশ্যিকতার নিয়ম আমরা অনুভব করতে পেরেছি। বংশগতির মধ্যে যে সুষ্ঠু শৃঙ্খলা রয়েছে শুধু তার কথাই ভেবে দেখা যেতে পারে, অথবা

সজীব সত্তার উপর বিষের- যেমন কোহলের প্রভাবের বিষয়টি। এক্ষেত্রে এখনও যে জিনিষটির অভাব রয়েছে তা হল অতীব সামান্যতা সম্পন্ন সম্পর্কগুচ্ছের তাৎপর্য অনুধাবন; শৃঙ্খলাসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব নেই।

মানুষ যতই সকল ঘটনার সুশৃঙ্খল নিয়মানুগতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে, তার প্রতীতি ততই দৃঢ়তর হবে যে এই সুশৃঙ্খল নিয়ম ানুগতার পাশাপাশি ভিন্নতর প্রকৃতির নিয়ম আর দিব্যশক্তির নিয়ম দুয়ের কোনোটিই প্রাকৃতিক ঘটনার স্বতন্ত্র কারণ হিস াবে থাকবে না। ঠিক কথা, প্রাকৃতিক ঘটনায় হস্তক্ষেপ করায় সমর্থ ব্যক্তিগত ঈশ্বরের তত্ত্ব কখনও প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানের স াহায্যে খন্ডন করা যায় না। কারণ, এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনও যেসব রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি সেখানে সকল সময়ে আশ্রয় নিতে পারে।

কিন্তু আমার প্রতীতি জন্মেছে যে ধর্মের প্রতিভূদের দিক থেকে এমন আচরণ শুধু অসমীচীনই নয়, মারাত্মক হবে। কারণ যে তত্ত্ব নিজেকে বজায় রাখতে পারে পরিষ্কার আলোয় নয়, অন্ধকারের মধ্যে, সে তত্ত্ব মানবজাতির উপর তার প্রভাব হার াবে, এবং মানবপ্রগতির অপরিমেয় ক্ষতি ঘটবে। নীতি সম্মত মঙ্গলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সংগ্রামে ধর্মগুদের পক্ষে ব্যক্তিগত ঈশ্বরের তত্ত্ব বর্জন করার মতো সাহস দেখাতে হবে, অর্থাৎ বর্জন করতে হবে ভীতি ও আশার সে উৎস যা অতীতকালে য াজক সম্প্রদায়ের হাতে একটা বিরাট ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল। তাঁদের প্রয়াসে কাজে লাগাতে হবে সেসব শক্তি যা মানবত ার মধ্যেই সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের চর্চায় সক্ষম। ঠিক করা এটা কঠিনতর কিন্তু অনেক বেশি যোগ্যতর কর্ম। (এই চিন্তা হাব ার্ট স্পেন্সারের চন্দ্বপ্তুনন্দ্বন্দ্রক্রুস্তু ট্রস্তুব্ধনক্ষ্ণ গ্রন্থে ঋাসোদ্দীপক ভঙ্গীতে উপস্থাপিত হয়েছে)। ধর্মগুরা যখন সুচিন্তিত সংশ োধনের প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করবেন তখন তাঁরা আনন্দের সঙ্গে উপলব্ধি করবেন যে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে সত্য ধর্ম মহত্তর এবং গভীরতর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আত্মকেন্দ্রিক কামনা ও ভীতির বন্ধন থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করা যদি ধর্মের একটি লক্ষ্য হয়, তাহলে অন্য দিক থেকেও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ধর্মকে সাহায্য দান করতে পারে। যদিও এটা সত্যি যে বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল এমন নিয়মের আবিষ্কার যা বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপনে ও তথ্যের পূর্বাভাস দানে সক্ষম হবে, তা হলেও এটা তার একমাত্র লক্ষ্য নয়। আ বিষ্কৃত সম্পর্কগুলিকে ন্যুনতম সংখ্যক পরস্পর স্বতন্ত্র মৌলিক ধারণায় কমিয়ে আনা এর অভীষ্ট। বহুর যুক্তিগ্রাহ্য ঐক্যস াধনের এই প্রয়াসের মধ্যে বিজ্ঞান তার বৃহত্তর সাফল্য অর্জন করে, যদিও ঠিক এপ্রয়াসটি আবার তাকে মায়াকুহকের শিকার হওয়ার প্রবল ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার নিবিড় অভিজ্ঞতা যাঁর হয়েছে এমন মানুষ মাত্রই অস্তিত্বের মধ্যে প্রকাশিত যুক্তি-মহিমার প্রতি বিনম্র দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেন, যে মহিমার গভীরতম প্রদেশ মানুষযের অধিগম্য নয়। কিন্তু আমার মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী'ধর্মীয়' কথাটির সর্বোত্তম অর্থে । আর তাই আমার এটাও মনে হয় যে বিজ্ঞান যে ধর্মীয় প্রেরণাকে তার নরত্বারোপের মালিন্য থেকেই পরিশুদ্ধ করে শুধু তা-ই নয়, আমাদের জীবনবোধের আধ্যাত্মিকীকরণের কাজেও এ সহায়ক হয়।

মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিবর্তন যতই এগিয়ে চলেছে, ততই আমার কাছে বেশি নিশ্চয় করে মনে হচ্ছে যে বিশুদ্ধ ধর্মপ্র াণতার পথটি জীবনভীতি, মৃত্যুভীতি ও অন্ধবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নয়, এ রয়েছে যুক্তিধর্মী জ্ঞানার্জনের প্রয়াসের ভেতর

দিয়েই। এই অর্থে আমার ৰিশ্বাস যদি তাঁর সু-উচ্চ শিক্ষানৈতিক মিশনের প্রতি সুবিচার করা তাঁর অভিপ্রায় হয় , তবে য াজককে গুর ভূমিকা নিতেই হবে।

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ

অনুবাদক ; অতীন্দ্রমোহন গুণ

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com